দেশনায়ক।

১৩১৩ জ্যৈষ্ঠের বঙ্গদর্শন হইতে উদ্ধৃত।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কলিকাতা।

২০ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ "দিমমণী প্রেসে" শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত

ও
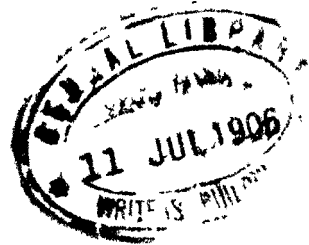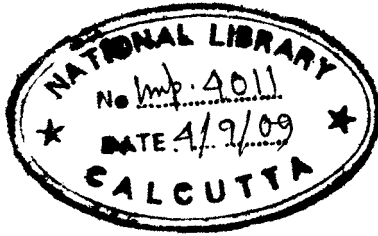
২০ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ মজুমদার লাইব্রেরি হইতে

এস্, সি, মজুমদার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

মূল্য ৶০।
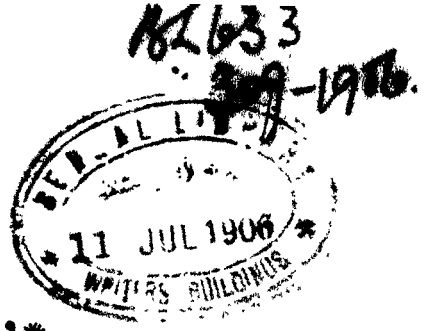
দেশনায়ক।*

এবারে বরিশাল প্রাদেশিকসমিতিতে বাঙালী খুব একটা আঘাত পাইয়াছে, সে কথা সকলেই জানেন। ভাতে মারার চেয়ে হাতে মারাটা উপস্থিতমত গুরুতর বলিয়াই মনে হয়। আইন কলের রোলারের মত নির্ম্মমভাবে আমাদের অনেক আশা দলন করিতে পারে, কিন্তু পুলিসের সাক্ষাৎ হস্তক্ষেপ বলিতে কি বুঝায়, সশরীরে তাহার অভিজ্ঞতালাভ সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকদের সদাসর্ব্বদা ঘটে না। এবারে অকস্মাৎ তাহার প্রত্যক্ষ পরিচয় পাইয়া দেশের মান্যগণ্য লোকের চিত্ত উদ্ভ্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে।

একটা প্রতিকারের পথ,—একটা কাজ করিবার ক্ষেত্র না পাইলে, বেদনা নিজের প্রতি উত্তেজনার সমস্ত বেগ আকর্ষণ করিয়া অসংযত হইয়া অপরিমিতরূপে বড় হইয়া উঠে। আমরা জানিতাম, ব্রিটিশরাজ্যে আইনজিনিষটা ধ্রুব—এইজন্য সকল উপদ্রবের উপর আইনের দোহাই পাড়িতাম- কিন্তু আইন স্বয়ং বিচলিত হইয়া উপদ্রবের আকার ধারণ করিলে ক্ষণকালের জন্যও মনকে শান্ত করিবার কোনো উপায় খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। জলের মধ্যে তুফান উঠিলে লোকে ডাঙার দিকে ছোটে—কিন্তু ভূমিকম্পে ডাঙা যখন স্বয়ং দুলিতে আরম্ভ করে, যাহাকে অচল বলিয়া সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত ছিলাম, সে যখন চঞ্চল হইতে থাকে, তখনি বিভীষিকা একেবারে বীভৎস হইয়া উঠে।

এইরূপ সাধারণ চঞ্চলতার সময় সৎপরামর্শের সময় নহে। আমিও এই দেশব্যাপী ক্ষোভের সময় স্থিরভাবে মন্ত্রণা দিতে অগ্রসর হইতাম না। কাল—যিনি নীরব, যিনি বিধাতার সুদৃঢ় দক্ষিণহস্ত, যিনি সকল ফলকে ধৈর্য্যের সহিত পাকাইতে থাকেন, আমিও নিষ্ঠার সহিত তাঁহারই নিগূঢ় নিয়মের প্রতি নির্ভর করিয়া প্রতীক্ষা করিব স্থির করিয়াছিলাম, কিন্তু একটি মহান্ আশ্বাস এই অসময়েও আমাকে উৎসাহিত করিয়াছে।

এবারে কর্ত্তৃপুরুষদের সহিত সংঘাতে বাঙালী জয়ী হইয়াছে। এই সঙ্কটকালে

---

* গত ১৫ই বৈশাখ শনিবার রায় পশুপতিনাথ বসু বাহাদুরের সৌধপ্রাঙ্গণে আহূত মহাসভায় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কর্ত্তৃক পঠিত।

বাঙালী যে বলের পরিচয় দিয়াছে, সেই বলের দৃষ্টান্তই তাহার সম্মুখে স্থিরভাবে ধরিব বলিয়া এই সভাস্থলে আমি অদ্য উপস্থিত হইয়াছি।

সেদিনকার উপদ্রবে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা সকলেই আমাদের ছাত্রদলের, যুবকগণের ও নায়কবর্গের অবিচলিত স্থৈর্য্য দেখিয়া বিস্ময়ান্বিত হইয়াছেন। যে উৎপাত কোনোমতে আশা করা যায় না, তাহা সহসা মাথার উপরে ভাঙিয়া পড়িলে তখনি মানুষের গম্ভীরতর প্রকৃতি আপনাকে অনাবৃতভাবে প্রকাশ করিয়া ফেলে। সেদিন বাঙালী নিজেকে যেরূপে ব্যক্ত করিয়াছে, তাহাতে আমাদের লজ্জার কোনো কারণ ঘটে নাই।

আপনারা সকলেই জানেন, সেদিন সভাপতিকে লইয়া যখন প্রতিনিধি ও সভাসদ্‌গণ মন্ত্রণাসভার পথে যাত্রা করিয়াছিলেন, তখন নায়কবর্গের আদেশ অনুসারে যাত্রিগণ কেহ একটি যষ্টিও গ্রহণ করেন নাই। এবং পুলিস যখন নিরস্ত্র-তাঁহাদের উপর পড়িয়া আঘাতবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল, তখনো নায়কদের উপদেশ স্মরণ করিয়া তাঁহারা দৃঢ়তার সহিত সমস্ত সহ্য করিয়াছেন।

আমি জানি, এ সম্বন্ধে অবিচারের আশঙ্কা আছে।

"তেজস্বিত্বমবলিপ্ততা মুখরতা বক্তৃর্য্যশক্তিঃ স্থিরে"

তেজস্বিতাকে অহঙ্কার, বাগ্মিতাকে মুখরতা এবং স্থৈর্য্যকে অশক্তি বলিয়া নিন্দুকে নিন্দা করে। সময়বিশেষে স্থৈর্য্য অশক্তির লক্ষণরূপে প্রকাশ পায় বটে, কিন্তু যখন তাহা বীর্য্য হইতে প্রসূত হয়, তখন তাহা বীর্য্যের শ্রেষ্ঠলক্ষণ বলিয়াই গণ্য হয়। বরিশালে কর্তৃপক্ষ অসংযমের দ্বারা হাস্যকর [illegible]তা এবং আমরা স্থৈর্য্যের দ্বারা শক্তির গা[illegible] [illegible] করিয়াছি, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

এই যে সাময়িক উৎপাতের দ্বারা আত্মবিস্মৃত না হইয়া সাধারণের মঙ্গলের উদ্দেশে আমরা উদ্বেল প্রবৃত্তিকে সম্পূর্ণ শাসনে রাখিয়াছিলাম, ইহার দ্বারাই আশান্বিত হইয়া উত্তেজনাশান্তির পূর্ব্বেই অদ্যকার সভায় আমি দুইএকটি কথা বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

দেশের হিতসাধন একটা বৃহৎ মঙ্গলের ব্যাপার, নিজের প্রবৃত্তির উপস্থিত চরিতার্থতাসাধন তাহার কাছে নিতান্তই তুচ্ছ। যদি এই বৃহৎ লক্ষ্যটাকে আমাদের হৃদয়ের সম্মুখে যথার্থভাবে ধরিয়া রাখিতে পারি, তবে ক্ষণিক উত্তেজনা,—ক্ষুদ্র অন্তর্দাহ আমাদিগকে পথভ্রষ্ট করিতে পারে না।

সৈন্যদল যখন রণক্ষেত্রে যাত্রা করে, তখন যদি পাশের গলি হইতে তাহাদিগকে কেহ গালি দেয় বা গায়ে ঢিল ছুঁড়িয়া মারে, তবে তখনি ছত্রভঙ্গ হইয়া অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য তাহারা পাশের গলিতে ছুটিয়া যায় না। এ অপমান তাহাদিগকে স্পর্শও করিতে পারে না—কারণ, তাহাদের সম্মুখে বৃহৎ সংগ্রাম, তাহাদের সম্মুখে মহৎ-মৃত্যু। তেমনি যদি আমরা যথার্থভাবে আমাদের এই বৃহৎ দেশের কাজ করিবার দিকে যাত্রা করি, তবে তাহারই মাহাত্ম্যে ছোট-বড় বহুতর বিক্ষোভ আমাদিগকে স্পর্শই করিতে পারে না—তবে ক্ষণে ক্ষণে একএকটা রাগারাগির ছুতা লইয়া ছুটাছুটি করিয়া বৃথা যাত্রাভঙ্গ করিতে প্রবৃত্তি হয় না।

আমাদের দেশে সম্প্রতি যে সকল

আন্দোলন-আলোচনার ঢেউ উঠিয়াছে, তাহার মধ্যে অনেকটা আছে,-- যাহা কলহমাত্র। নিঃসন্দেহই দেশবৎসল লোকেরা এই কলহের জন্য অন্তরে-অন্তরে লজ্জা অনুভব করিতেছেন। কারণ, কলহ অক্ষমের উত্তেজনাপ্রকাশ, তাহা অকর্ম্মণ্যের একপ্রকার আত্মবিনোদন। আপনাদের কাছে আমি স্পষ্টই স্বীকার করিতেছি, বাঙালীর মুখে "বয়কট্"শব্দের আস্ফালনে আমি বারংবার মাথা হেঁট করিয়াছি। আমাদের পক্ষে এমন সঙ্কোচজনক কথা আর নাই। বয়কট্ দুর্ব্বলের প্রয়াস নহে, ইহা দুর্ব্বলের কলহ। আমরা নিজের মঙ্গলসাধনের উপলক্ষ্যে নিজের ভাল করিলাম না, আজ পরের মন্দ করিবার উৎসাহেই নিজের ভাল করিতে বসিয়াছি, এ কথা মুখে উচ্চারণ করিবার নহে। আমি অনেক বক্তাকে উচ্চৈস্বরে বলিতে শুনিয়াছি —"আমরা য়ুনিভর্সিটিকে বয়কট্ করিব?" কেন করিব? য়ুনিভর্সিটি যদি ভাল জিনিষ হয়, তবে তাহার সঙ্গে গায়ে পড়িয়া আড়ি করিয়া দেশের অহিত করিবার অধিকার আমাদের কাহারো নাই। যদি য়ুনিভর্সিটি অসম্পূর্ণ হয়, যদি তাহা আমাদিগকে অভীষ্টফল দান না করে, তবে তাহাকে বর্জ্জন করাকে বয়কট্ করা বলে না। যে মনিব বেতন দেয় না, তাহার কর্ম্ম ছাড়িয়া দেওয়াকে বয়কট্ করা বলে না। কচ দৈত্যগুরুর আশ্রমে আসিয়া দৈত্যদের উৎপীড়ন ও গুরুর অনিচ্ছাসত্ত্বেও ধৈর্য্য ও কৌশল অবলম্বনপূর্ব্বক বিদ্যালাভ করিয়া দেবগণকে জয়ী করিয়াছেন। জাপানও য়ুরোপের আশ্রম হইতে এইরূপ কচের মতই বিদ্যালাভ করিয়া আজ জয়যুক্ত হইয়াছেন। দেশের যাহাতে ইষ্ট, তাহা যেমন করিয়াই হউক্ সংগ্রহ করিতে হইবে, সেজন্য সমস্ত সহ্য করা পৌরুষেরই লক্ষণ—তাহার পর সংগ্রহকার্য্য শেষ হইলে স্বাতন্ত্র্যপ্রকাশ করিবার দিন আসিতে পারে। দেশের কাজে রাগারাগিটা কখনই লক্ষ্য হইতে পারে না। দেশের কাজের মাহাত্ম্য যদি আমরা মনের মধ্যে ধারণ করিয়া রাখিতে পারি, তবে তাহারই উদ্দেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উত্তেজনা আমরা উপেক্ষা করিয়া কর্ত্তব্যপথে স্থির থাকিতে পারিব।

আমাদের সৌভাগ্যক্রমে, দেশে স্বদেশী উদ্যোগ আজ যে এমন ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, বয়কট্ তাহার প্রাণ নহে। একটা তুচ্ছ কলহের ভাব কখনই দেশের অন্তঃকরণকে এমন করিয়া টানিতে পারিত না। এই যে স্বদেশী উদ্যোগের আহ্বানমাত্রে দেশ এক মুহূর্ত্তে সাড়া দিয়াছে, কার্জ্জনের সঙ্গে আড়ি তাহার কারণ হইতেই পারে না; জগতে কার্জ্জন এত-বড় লোক নহে; এই আহ্বান দেশের শুভবুদ্ধির সিংহদ্বারে আঘাত করিয়াছিল বলিয়াই আজ ইহা এত দ্রুত এমন সমাদর পাইয়াছে। আজ আমরা দেশের কাপড় পরিতেছি কেবল পরের উপর রাগ করিয়া, এই যদি সত্য হয়, তবে দেশের কাপড়ের এত-বড় অবমাননা আর হইতেই পারে না। আজ আমরা স্বায়ত্তভাবে দেশের শিক্ষার উন্নতিসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছি, রাগারাগিই যদি তাহার ভিত্তিভূমি হয়, তবে এই বিদ্যালয়ে আমরা জাতীয় অগৌরবের স্মরণস্তম্ভ রচনা করিতেছি।

আরো লজ্জার কারণ এই যে, বয়কটের মধ্যে আমরা যে স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিতেছি, সেই স্পর্দ্ধার শক্তিটা কোথায় অবস্থিত? সে কি আমাদের নিজের গায়ের জোরে, না ইংরেজ-

শাসনতন্ত্রের ক্ষমাগুণে! যখনি সেই ক্ষমাগুণের লেশমাত্র বৈলক্ষণ্য দেখি, যখনি মানবধর্ম্ম-বর্জিত স্পর্দ্ধার বিরুদ্ধে ক্ষমতাশালীর আক্রোশ আইনের বেড়ার কোনো-একটা অংশ একটু-মাত্র আল্‌গা করিয়া ফেলে, অমনি আমরা বিস্মিত ও উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠি এবং তৎক্ষণাৎ প্রমাণ করিয়া দিই যে, পরের ধৈর্য্যের প্রতি বিশ্বাসস্থাপন করিয়াই আমরা পরকে উদ্বেজিত করিতেছিলাম। আমাদের স্পর্দ্ধা যদি যথার্থ আমাদেরই শক্তি হইতে উদ্ভূত হইত, তবে অপরপক্ষের স্বাভাবিক রোষ এবং শাসনের কাঠিন্য আমরা স্বীকার করিয়া লইতাম, তবে উদ্যতমুষ্টি দেখিবামাত্র তৎক্ষণাৎ আমরা মিণ্টো-মর্লির দোহাই পাড়িতে ও আদালতের আব্দার কাড়িতে ছুটিতাম না।

এ কথা মানিতেই হয় যে, স্বভাবের নিয়মে স্পর্দ্ধার বিরুদ্ধে ক্রোধ উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং সক্ষমের ক্রোধ কোনো-না-কোনো উপায়ে হিংসার আকার ধারণ করে। যদি আমরা ইংরেজকে বলি, "তোমাকে জব্দ করিবার জন্যই আমরা দেশের ভাল করিতেছি" এবং তার পরে ইংরেজ রক্তচক্ষু হইবামাত্র বলি, "বাঃ, আমরা দেশের ভাল করিতেছি, তোমরা রাগ করিতেছ কেন", তবে গাম্ভীর্য্যরক্ষা করা কঠিন হয়।

জব্দ করিতে পারার একটা সুখ আছে, সন্দেহ নাই—কিন্তু দেশের ভাল করিতে পারার সুখ যদি তাহার চেয়ে বড় হয়, তবে তাহারই খাতির রাখিতে হয়। আমরা বয়কট্ করিয়াই দেশীকাপড় চালাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, এ কথা বলিবামাত্র দেশীকাপড় চালানো বিঘ্ন-সঙ্কুল হইয়া উঠে, সুতরাং জব্দ করিবার সুখ ভোগ করিতে গিয়া ভাল করিবার সুখ খর্ব্ব করিতে হয়। দেশীকাপড় চালানো ইংরেজের বিরুদ্ধে আমাদের একটা লড়াই, এ কথা বলিলেই যাহা আমাদের চিরন্তন মঙ্গলের পবিত্র ব্যাপার, তাহাকে মল্লবেশ পরাইয়া পোলিটিকাল্ আখ্ড়ায় টানিয়া আনিতে হয়; ইংরেজ তখন এই উদ্যোগকে কেবল যে নিজের দেশের তাঁতীর লোকসান বলিয়া দেখে, তাহা নয়, এই হার-জিতের ব্যাপারকে একটা পোলিটিকাল্ সংগ্রাম বলিয়া গণ্য করে। ইহাতে ফল হয় এই যে, নিজের দুর্ব্বল প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার উদ্দেশে আমরা স্বদেশের হিতকে ইচ্ছাপূর্ব্বক বিপদের মুখে ফেলিয়া দিই। আমাদের দেশে ত অন্তরে-বাহিরে, নিজের চরিত্রে ও পরের প্রতিকূলতায় বিঘ্ন ভুরিভুরি আছে, তাহার 'পরে আস্ফালন করিয়া নূতন বিঘ্নকে হাঁক দিয়া ডাকিয়া আনিব, এত-বড় অনাবশ্যক শক্তিক্ষয়ের উপযুক্ত সঞ্চয় যে আমাদের কোথায় আছে, তাহার সন্ধান ত আমি জানি না।

বড়-বড় স্বাধীনজাতিকেও বিবেচনা করিয়া চলিতে হয়— স্তব্ধ হইয়া থাকিতে হয়। স্বজাতির মঙ্গলসম্বন্ধে যাহাদের দায়িত্ববোধ আছে, তাহারা তেজস্বী হইলেও অনেক লাঙ্গুলমর্দ্দন বিনম্রফণায় নিঃশব্দে স্বীকার করে—ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জর্ম্মণিতে ইহার অনেক দৃষ্টান্ত দেখা গেছে। জাপান চীনের সঙ্গে লড়াইয়ে জয়ী হইয়াও রাশিয়ার চক্রান্তে লড়াইয়ের ফল যখন ভোগ করিতে পারে নাই, তখন চুপ করিয়া ছিল—আজ রাশিয়াকে পরাস্ত করিয়াও বন্ধুদের মধ্যস্থতায় যখন রক্তপাতের পুরামূল্য আদায় করিতে পারিল

না, তখন হাস্যমুখে বন্ধুগণকে ধন্যবাদ জানাইল। কেন? ইহার কারণ, অসহিষ্ণু হইয়া তেজ দেখাইতে যাওয়াই দুর্ব্বলতা, দেশের মঙ্গলকে শিরোধার্য্য করিয়া স্তব্ধ হইয়া থাকাই যথার্থ বীরত্ব। যদি ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জাপানের পক্ষে এ কথা সত্য হয়, যদি তাহারা ঔদ্ধত্যপ্রকাশ করিয়া উন্নতির যাত্রাপথে স্বজাতির বোঝা বাড়াইয়া তুলিতে সর্ব্বদাই কুণ্ঠিত হয়, তবে আমাদের এই অতি ক্ষুদ্র কর্ম্মক্ষেত্রে কেবল কথায়-কথায় সশব্দে তাল ঠুকিয়া বেড়ানই কি আমাদের পক্ষে সকলের চেয়ে বড় কাজ বলিয়া গণ্য করিতে হইবে? যথাসাধ্য মৌন থাকিয়া,—স্তব্ধ থাকিয়া আমাদের চলিবার পথের বিপুলকায় বিঘ্নদৈত্যগুলিকে নিদ্রিত রাখাই কি আমাদের কর্ত্তব্য হইবে না? অবশ্য, কারণ ঘটিলে ক্ষোভ অনুভব না করিয়া থাকা যায় না—কিন্তু অসময়ে অকিঞ্চিৎকরভাবে সেই ক্ষোভের অপব্যয় করা না করা আমাদের আয়ত্তাধীন হওয়া উচিত।

একবার দেশের চারিদিকে চাহিয়া দেখিবেন, এত দুঃখ এমন নিঃশব্দে বহন করিয়া চলিয়াছে, এরূপ করুণ দৃশ্য জগতের আর কোথাও নাই। নৈরাশ্য ও নিরানন্দ, অনশন ও মহামারী এই প্রাচীন ভারতবর্ষের মন্দিরভিত্তির প্রত্যেক গ্রন্থি বিদীর্ণ করিয়া শিকড় বিস্তার করিয়াছে। দুঃখের মত এমন কঠোর সত্য,—এমন নিদারুণ পরীক্ষা আর কি আছে? তাহার সঙ্গে খেলা চলে না—তাহাকে ফাঁকি দিবার জো কি, তাহার মধ্যে কৃত্রিম কাল্পনিকতার অবকাশমাত্র নাই—সে শত্রুমিত্র সকলকেই শক্ত করিয়া বাজাইয়া লয়। এই দেশব্যাপী ভীষণ দুঃখের সম্বন্ধে আমরা কিরূপ ব্যবহার করিলাম, তাহাতেই আমাদের মনুষ্যত্বের যথার্থ পরিচয়। এই দুঃখের কৃষ্ণ-কঠিন নিকষপাথরের উপরে আমাদের দেশানুরাগ যদি উজ্জ্বল রেখাপাত করিয়া না থাকে, তবে আপনারা নিশ্চয় জানিবেন, তাহা খাঁটি সোনা নহে। যাহা খাঁটি নহে, তাহার মূল্য আপনারা কাহার কাছে প্রত্যাশা করেন? ইংরেজজাত যে এ সম্বন্ধে জহরী, তাহাকে ফাঁকি দিবেন কি করিয়া? আমাদের দেশহিতৈষণার উদ্যোগ তাহাদের কাছে শ্রদ্ধা-লাভ করিবে কি উপায়ে? আমরা নিজে দান করিলে তবেই দাবী করিতে পারি। কিন্তু সত্য করিয়া বলুন, কে আমরা কি করিয়াছি? দেশের দারুণ দুর্যোগের দিনে আমাদের মধ্যে যাহাদের সুখের সম্বল আছে, তাহারা সুখেই আছি; যাহাদের অবকাশ আছে, তাহাদের আরামের লেশমাত্র ব্যাঘাত হয় নাই; ত্যাগ যেটুকু করিয়াছি, তাহা উল্লেখযোগ্যই নহে; কষ্ট যেটুকু সহিয়াছি, আর্ত্তনাদ তাহা অপেক্ষা অনেক বেশিমাত্রায় করা হইয়াছে।

ইহার কারণ কি? ইহার কারণ এই যে, এতকাল পরের দ্বারে আমরা মাথা কুটিয়া মরিবার চর্চ্চা করিয়া আসিয়াছি, স্বদেশ-সেবার চর্চ্চা করি নাই। দেশের দুঃখ দূর—হয় বিধাতা, নয় গবর্মেণ্ট, করিবেন, এই ধারণাকেই আমরা সর্ব্ব-উপায়ে প্রশ্রয় দিয়াছি। আমরা যে দলবদ্ধ,—প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া নিজে এই কার্য্যে ব্রতী হইতে পারি, এ কথা আমরা অকপটভাবে নিজের কাছেও স্বীকার করি নাই। ইহাতে দেশের লোকের সঙ্গে আমাদের হৃদয়ের সম্বন্ধ থাকে না, দেশের দুঃখের

সঙ্গে আমাদের চেষ্টার যোগ থাকে না, দেশানুরাগ বাস্তবতার ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত হয় না—সেইজন্যই চাঁদার খাতা মিথ্যা ঘুরিয়া মরে এবং কাজের দিনে কাহারো সাড়া পাওয়া যায় না।

আজ ঠিক কুড়িবৎসর হইল, প্রেসিডেন্সি-কলেজের তদানীন্তন অধ্যাপক ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার রায় মহাশয়ের বাড়ীতে ছাত্রসম্মিলন উপলক্ষ্যে যে গান রচিত হইয়াছিল, তাহার এক অংশ উদ্ধৃত করি—

মিছে—

কথার বাঁধুনি কাঁদুনির পালা,
চোখে নাই কারো নীর,
আবেদন আর নিবেদনের থালা
বহে' বহে' নতশির।
কাঁদিয়ে সোহাগ ছিছি একি লাজ,
জগতের মাঝে ভিখারীর সাজ,
আপনি করি নে আপনার কাজ,
পরের 'পরে অভিমান।

ওগো—

আপনি নামাও কলঙ্কপসরা,
যেয়ো না পরের দ্বার।
পরের পায়ে ধরে' মানভিক্ষা করা
সকল ভিক্ষার ছার।
দাও দাও বলে' পরের পিছু-পিছু
কাঁদিয়ে বেড়ালে মেলে না ত কিছু
যদি মান চাও যদি প্রাণ চাও
প্রাণ আগে কর দান।

সেদিন হইতে কুড়িবৎসরের পরবর্ত্তী ছাত্রগণ আজ নিঃসন্দেহ বলিবেন যে, এখন আমরা আবেদনের থালা নামাইয়া ত হাত খোলসা করিয়াছি, আজ ত আমরা নিজের কাজ নিজে করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছি। যদি সত্যই হইয়া থাকি ত ভালই, কিন্তু পরের 'পরে অভিমানটুকু কেন রাখিয়াছি—যেখানে অভিমান আছে, সেইখানেই যে প্রচ্ছন্নভাবে দাবী রহিয়া গেছে। আমরা পুরুষের মত বলিষ্ঠভাবে স্বীকার করিয়া না লই কেন যে, আমরা বাধা পাইবই, আমাদিগকে প্রতিকূলতা অতিক্রম করিতে হইবেই; কথায়-কথায় আমাদের দুই চক্ষু এমন ছল্‌ছল্‌ করিয়া আসে কেন! আমরা কেন মনে করি, শত্রু-মিত্র সকলে মিলিয়া আমাদের পথ সুগম করিয়া দিবে। উন্নতির পথ যে সুদুস্তর, এ কথা জগতের ইতিহাসে সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ—

"ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া
দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।"

কেবল কি আমরাই—এই দুরত্যয় পথ যদি অপরে সহজ করিয়া, সমান করিয়া না দেয়—তবে নালিশ করিয়া দিন কাটাইব—এবং মুখ অন্ধকার করিয়া বলিব, তবে আমরা নিজের তাঁতের কাপড় নিজে পরিব, নিজের বিদ্যালয়ে নিজে অধ্যয়ন করিব! এ সমস্ত কি অভিমানের কথা!

আমি জিজ্ঞাসা করি, সর্ব্বনাশের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কাহারো কি অভিমান মনে আসে—মৃত্যুশয্যার শিয়রে বসিয়া কাহারো কি কলহ করিবার প্রবৃত্তি হইতে পারে! আমরা কি দেখিতেছি না, আমরা মরিতে সুরু করিয়াছি! আমি রূপকের ভাষায় কথা কহিতেছি না,—আমরা সত্যই মরিতেছি। যাহাকে বলে বিনাশ, যাহাকে বলে বিলোপ, তাহা নানা বেশ ধারণ করিয়া এই পুরাতন জাতির আবাসস্থলে আসিয়া দেখা দিয়াছে। ম্যালেরিয়ায় শতসহস্র লোক মরিতেছে এবং যাহারা মরিতেছে না, তাহারা জীবন্মৃত হইয়া

পৃথিবীর ভারবৃদ্ধি করিতেছে। এই ম্যালেরিয়া পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে, প্রদেশ হইতে প্রদেশান্তরে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে। প্লেগ্ এক রাত্রির অতিথির মত আসিল, তার পরে বৎসরের পর বৎসর যায়, আজও তাহার নররক্তপিপাসার নিবৃত্তি হইল না। যে বাঘ একবার মনুষ্য-মাংসের স্বাদ পাইয়াছে, সে যেমন কোনোমতে সে প্রলোভন ছাড়িতে পারে না, দুর্ভিক্ষ তেম্‌নি করিয়া বারংবার ফিরিয়া-ফিরিয়া আমাদের লোকালয়কে জনশূন্য করিয়া দিতেছে। ইহাকে কি আমরা দৈবদুর্ঘটনা বলিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকিব? সমস্ত দেশের উপরে মৃত্যুর এই যে অবিচ্ছিন্ন জাল-নিক্ষেপ দেখিতেছি, ইহাকে কি আমরা আকস্মিক বলিতে পারি?

ইহা আকস্মিক নহে। ইহা বদ্ধমূল ব্যাধির আকার ধারণ করিতেছে। এম্‌নি করিয়া অনেক জাতি মারা পড়িয়াছে—আমরাও সে দেশব্যাপী মৃত্যুর আক্রমণ হইতে বিনা চেষ্টায় নিষ্কৃতি পাইব, এমন ত কোনো কারণ দেখি না। আমরা চক্ষের সমক্ষে দেখিতেছি যে, যে-সব জাতি সুস্থ-সবল, তাহারাও প্রাণরক্ষার জন্য প্রতিক্ষণে লড়াই করিতেছে—আর আমরা আমাদের জীর্ণতার উপরে মৃত্যুর পুনঃপুন নখরাঘাতসত্ত্বেও বিনা প্রয়াসে বাঁচিয়া থাকিব?

এ কথা আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে, ম্যালেরিয়া-প্লেগ্-দুর্ভিক্ষ কেবল উপলক্ষ্যমাত্র, তাহারা বাহ্যলক্ষণমাত্র—মূল ব্যাধি দেশের মজ্জার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। আমরা এতদিন একভাবে চলিয়া আসিতেছিলাম—আমাদের হাটে, বাটে, গ্রামে, পল্লীতে আমরা একভাবে বাঁচিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলাম, আমাদের সে ব্যবস্থা বহুকালের পুরাতন। তাহার পরে আজ বাহিরের সংঘাতে আমাদের অবস্থান্তর ঘটিয়াছে। এই নূতন অবস্থার সহিত এখনো আমরা সম্পূর্ণ আপোস করিয়া লইতে পারি নাই—এক জায়গায় মিলাইয়া লইতে গিয়া আর-এক জায়গায় অঘটন ঘটিতেছে। যদি এই নূতনের সহিত আমরা কোনোদিন সামঞ্জস্য করিয়া লইতে না পারি, তবে আমাদিগকে মরিতেই হইবে। পৃথিবীতে যে সকল জাতি মরিয়াছে, তাহারা এম্‌নি করিয়াই মরিয়াছে।

ম্যালেরিয়ার কারণ দেশে নূতন হইয়াছে, এমন নহে। চিরদিনই আমাদের দেশ জলা-দেশ—বনজঙ্গল এখনকার চেয়ে বরং পূর্ব্বে বেশিই ছিল, এবং কোনোদিন এখানে মশার অভাব ছিল না। কিন্তু দেশ তখন সচ্ছল ছিল। যুদ্ধ করিতে গেলে রসদের দরকার হয়—সর্ব্বপ্রকার গুপ্ত মারীশত্রুর সহিত লড়াইয়ে সেদিন আমাদের রসদের অভাব ছিল না। আমাদের পল্লীর অন্নপূর্ণা সেদিন নিজের সন্তানদিগকে অর্দ্ধভুক্ত রাখিয়া টাকার লোভে পরের ছেলেকে স্তন্য দিতে যাইতেন না। শুধু তাই নয়, তখনকার সমাজব্যবস্থায় পল্লীর জলাশয় খনন ও সংস্কারের জন্য কাহারো অপেক্ষা করিতে হইত না—পল্লীর ধর্ম্মবুদ্ধি পল্লীর অভাবমোচনে নিয়ত জাগ্রত ছিল। আজ বাংলার গ্রামে গ্রামে কেবল যে জলকষ্ট হইয়াছে, তাহা নহে, প্রাচীন জলাশয়গুলি দূষিত হইয়াছে। এইরূপে শরীর যখন অন্নাভাবে হীনবল এবং পানীয়জল যখন শোধনাভাবে রোগের নিকেতন, তখন বাঁচিবার উপায় কি? এইরূপে প্লেগও

সহজেই আমাদের দেশ অধিকার করিয়াছে—কোথাও সে বাধা পাইতেছে না, কারণ পুষ্টি-অভাবে আমাদের শরীর অরক্ষিত।

পুষ্টির অভাব ঘটিবার প্রধান কারণ, নানা নূতন নূতন প্রণালীযোগে অন্ন বাহিরের দিকে প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে—আমরা যাহা খাইয়া এতদিন মানুষ হইয়াছিলাম, তাহা যথেষ্ট-পরিমাণে পাইতেছি না। আজ পাড়াগাঁয়ে যান, সেখানে দুধ দুর্লভ, ঘি দুর্ম্মূল্য, তেল কলিকাতা হইতে আসে, তাহাকে পূর্ব্ব-অভ্যাস-বশত সরিষার তেল বলিয়া নিজেকে সান্ত্বনা দিই—তা ছাড়া, যেখানে জলকষ্ট, সেখানে মাছের প্রাচুর্য্য নাই, সে কথা বলা বাহুল্য। সস্তার মধ্যে সিঙ্কোনা সস্তা হইয়াছে। এইরূপে একদিনে নহে, দিনে দিনে সমস্তদেশের জীবনী শক্তির মূলসঞ্চয় ক্রমে ক্রমে ক্ষয় হইয়া যাইতেছে। যেমন মহাজনের কাছে যখন প্রথম দেনা করিতে আরম্ভ করা যায়, তখনো শোধ করিবার সম্বল ও সম্ভাবনা থাকে; কিন্তু সম্পত্তি যখন ক্ষীণ হইতে থাকে, তখন যে মহাজন একদা কেবল নৈমিত্তিক ছিল, সে নিত্য হইয়া উঠে—আমাদের দেশেও ম্যালেরিয়া, প্লেগ্, ওলাউঠা, দুর্ভিক্ষ একদিন আকস্মিক ছিল, কিন্তু এখন ক্রমে আর কোনো-কালে তাহাদের দেনাশোধ করিবার উপায় দেখা যায় না, আমাদের মূলধন ক্ষয় হইয়া আসিয়াছে, এখন তাহারা আর কেবল ক্ষণে ক্ষণে তাগিদ করিতে আসে না, তাহারা আমাদের জমিজমাতে, আমাদের ঘরবাড়ীতে নিত্য হইয়া বসিয়াছে। বিনাশ যে এম্‌নি করিয়াই ঘটে, বৎসরে বৎসরে তাহার কি হিসাব পাওয়া যাইতেছে না?

এমন অবস্থায় রাজার মন্ত্রণাসভায় ছুটো প্রশ্ন উত্থাপন করিতে ইচ্ছা কর যদি ত কর, তাহাতে আমি আপত্তি করিব না। কিন্তু সেইখানেই কি শেষ? আমাদের গরজ কি তাহার চেয়ে অনেক বেশি নহে? ঘরে আগুন লাগিলে কি পুলিসের থানাতে খবর পাঠাইয়া নিশ্চিন্ত থাকিবে? ইতিমধ্যে চোখের সাম্‌নে যখন স্ত্রীপুত্র পুড়িয়া মরিবে, তখন দারোগার শৈথিল্যসম্বন্ধে ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে নালিশ করিবার জন্য বিরাট্ সভা আহ্বান করিয়া কি বিশেষ সান্ত্বনালাভ করা যায়? আমাদের গরজ যে অত্যন্ত বেশি! আমরা যে মরিতেছি। আমাদের অভিমান করিবার, কলহ করিবার, অপেক্ষা করিবার আর অবসর নাই। যাহা পারি, তাহাই করিবার জন্য এখনি আমাদিগকে কোমর বাঁধিতে হইবে। চেষ্টা করিলেই যে, সকল সময়েই সিদ্ধিলাভ হয়, তাহা না হইতেও পারে, কিন্তু কাপুরুষের নিষ্ফলতা যেন না ঘটিতে দিই—চেষ্টা না করিয়া যে ব্যর্থতা, তাহা পাপ, তাহা কলঙ্ক।

আমি বলিতেছি, আমাদের দেশে যে দুর্গতি ঘটিয়াছে, তাহার কারণ আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে এবং তাহার প্রতিকার আমাদের নিজের ছাড়া আর কাহারো দ্বারা কোনো-দিন সাধ্য হইতে পারে না। আমরা পরের পাপের ফলভোগ করিতেছি, ইহা কখনই সত্য নহে এবং নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত সুকৌশলে পরকে দিয়া করাইয়া লইব, ইহাও কোনোমতে আশা করিতে পারি না।

সৌভাগ্যক্রমে আজ দেশের নানাস্থান হইতে এই প্রশ্ন উঠিতেছে—'কি করিব, কেমন

করিয়া করিব ?' আজ আমরা কর্ম্ম করিবার ইচ্ছা অনুভব করিতেছি, চেষ্টায়ও প্রবৃত্ত হইতেছি—এই ইচ্ছা যাহাতে নিরাশ্রয় না হয়, এই চেষ্টা যাহাতে বিক্ষিপ্ত হইয়া না পড়ে, প্রত্যেকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তি যাহাতে বিচ্ছিন্ন-কণা-আকারে বিলীন হইয়া না যায়, আজ আমাদিগকে সেই দিকে সম্পূর্ণ মনোযোগ দিতে হইবে। রেলগাড়ির ইষ্টিম্ উচ্চস্বরে বাঁশী বাজাইবার জন্য হয় নাই, তাহা গাড়ি চালাইবার জন্যই হইয়াছে। বাঁশী বাজাইয়া তাহা সমস্তটা ফুঁকিয়া দিলে ঘোষণার কাজটা জমে বটে, কিন্তু অগ্রসর হইবার কাজটা বন্ধ হইয়া যায়। আজ দেশের মধ্যে যে উদ্যম উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, তাহাকে একটা বেষ্টনের মধ্যে না আনিতে পারিলে তাহা নিজের মধ্যে কেবল বিরোধ করিতে থাকিবে, নূতন নূতন দলের সৃষ্টি করিবে এবং নানা সাময়িক উদ্বেগের আকর্ষণে তুচ্ছ কাজকে বড় করিয়া তুলিয়া নিজের অপব্যয় সাধন করিবে।

দেশের সমস্ত উদ্যমকে বিক্ষেপের ব্যর্থতা হইতে একের দিকে ফিরাইয়া আনিবার একমাত্র উপায় আছে—কোনো একজনকে আমাদের অধিনায়ক বলিয়া স্বীকার করা। এ কথা পূর্ব্বেও একবার বলিয়াছি, সেও বেশিদিনের কথা নহে। সেই অল্পদিনের মধ্যে সময়ের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তখনো আমরা কার্য্যক্ষেত্রে নামিবার জন্য মনের মধ্যে প্রস্তুত ছিলাম না। এইজন্য তখনো আমরা তর্কবিতর্কের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচারজাল ছেদন করিয়া প্রশস্ত কর্ম্মপথে মুক্তিলাভ করিবার জন্য কোনো অভাব অনুভব করি নাই। তখনো ডিবেটিং সোসাইটির দ্বারাতেই দেশের কাজ চালানো যায়, এইরূপ একটা বাল্যসংস্কার আমাদের মনে ছিল। আজ কার্য্যক্ষেত্রে নামিতে উদ্যত হইয়াছি; আজ এতক্ষণে নিশ্চয়ই অন্তত একটুও বুঝিয়াছি যে, দশে মিলিয়া যেমন করিয়া বাদবিবাদ করা যায়, দশে মিলিয়া ঠিক তেমন করিয়া কাজ করা চলে না। ঝগড়া করিতে গেলে হট্টগোল করা সাজে, কিন্তু যুদ্ধ করিতে গেলে সেনাপতি চাই। কথা চালাইতে গেলে নানা লোকে মিলিয়া স্বস্ব কণ্ঠস্বরকে উচ্চ হইতে উচ্চতর সপ্তকে উৎক্ষিপ্ত করিবার চেষ্টা করা যায়, কিন্তু জাহাজ চালাইতে গেলে একজন কাপ্তেনের প্রয়োজন।

অল্পকাল পূর্ব্বে বাংলাদেশে স্বদেশী আন্দোলনের যখন প্রথম জোয়ার আসিয়াছিল, তখন ছাত্রদের মুখে এবং চারিদিকে "নেতা" "নেতা" "নেতা" রব উঠিয়াছিল। তখন এই নেতৃহীন দেশে অকস্মাৎ নেতা এতই অদ্ভুত সুলভ হইয়াছিল যে, আমাদের মত সাহিত্য-রসবিহ্বল অকর্ম্মণ্য লোকেরও নেতা হইবার সাংঘাতিক ফাঁড়া নিতান্তই অল্পের উপর দিয়া কাটিয়াছে। শান্তিপ্রিয় ভদ্রলোকদের তখন এমনি বিপদের দিন গেছে যে, "আমি নেতা নই" বলিয়া গলায় চাদর দিলেও সেই তাহার গলার চাদরটা ধরিয়াই তাহাকে নেতার কাঠ-গড়ায় টানিয়া আনিবার নির্দ্দয় চেষ্টা করা হইয়াছে।

হঠাৎ সমস্ত দেশের এইরূপ উৎকট 'নেতা'বায়ুগ্রস্ত হইবার কারণ এই যে, কাজের হাওয়া দিবামাত্রই স্বভাবের নিয়মে সবপ্রথমে নেতাকে ডাক পড়িবেই। সেই ডাকে প্রথম ধাক্কায় বাজারে ছোট-বড় খুঁটা-খাঁটি বহুবিধ

নেতার আমদানি হয় এবং লোকে প্রাণের গরজে বিচার করিবার সময় পায় না,—নেতা লইয়া টানাটানি-কাড়াকাড়ি করিতে থাকে। ইহাতে করিয়া অনেক মিথ্যার,—অনেক কৃত্রিমতার সৃষ্টি হয়, কিন্তু ইহার মধ্যে আসল সত্যটুকু এই যে, আমাদের নিতান্তই নেতা চাই—নহিলে আমাদের আশা-উদ্যম-আকাঙ্ক্ষা সমস্ত ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে।

যাহা হউক্, একদিন যখন নেতাকে ডাকি নাই, কেবল বক্তৃতাসভার সভাপতিকে খুঁজিয়াছিলাম, সেদিন গেছে; তার পরে একদিন যখন "নেতা নেতা" করিয়া উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিলাম, সেদিনও আজ নাই; অতএব আজ অপেক্ষাকৃত স্থিরচিত্তে আমাদের একজন দেশনায়ক বরণ করিয়া লইবার প্রস্তাব পুনর্ব্বার সর্ব্বসমক্ষে উত্থাপন করিবার সময় হইয়াছে বলিয়া অনুভব করিতেছি। এ সম্বন্ধে আজ কেবল যে আমাদের বোধশক্তি পরিষ্কার হইয়াছে, তাহা নহে, আমাদের ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াছে এবং দেশের হৃদয় নানা আন্দোলনের ও নানা পরিভ্রমণের পরেও অবশেষে যাঁহাকে নেতা বলিয়া স্বীকার করিতে চাহে, তাঁহার পরিচয় অদ্য যেন পরিস্ফুটতর হইয়া উঠিয়াছে।

আমি জানি, এই সভাস্থলে, দেশনায়ক বলিয়া আমি যাঁহার নাম লইতে উদ্যত হইয়াছি, তাঁহার নাম আজ কেবল বাংলাদেশে নহে, ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। আমি জানি, আজ বঙ্গলক্ষ্মী যদি স্বয়ম্বরা হইতেন, তবে তাঁহারই কণ্ঠে বরমাল্য পড়িত। ব্রাহ্মণের ধৈর্য্য ও ক্ষত্রিয়ের তেজ যাঁহাতে একত্রে মিলিত, যিনি সরস্বতীর নিকট হইতে বাণী পাইয়াছেন, এবং যাঁহার অক্লান্ত কর্ম্মপটুতা স্বয়ং বিশ্বলক্ষ্মীর দান—আজ বাংলাদেশের দুর্যোগের দিনে যাঁহারা নেতা বলিয়া খ্যাত, সকলের উপরে যাঁহার মস্তক অভ্রভেদী গিরিশিখরের মত বজ্রগর্ভ মেঘপুঞ্জের মধ্যে জাগিয়া উঠিয়াছে, সেই সুরেন্দ্রনাথকে সকলে মিলিয় প্রকাশ্যভাবে দেশনায়করূপে বরণ করিয়া লইবার জন্য আমি সমস্ত বঙ্গবাসীকে আজ আহ্বান করিতেছি।

সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার নবযৌবনের জ্যোতিঃপ্রদীপ্ত প্রভাতে দেশহিতের জাহাজে হাল ধরিয়া যেদিন যাত্রা আরম্ভ করিয়াছিলেন, সেদিন ইংরেজিশিক্ষাগ্রস্ত যুবকগণ একটিমাত্র বন্দরকেই আপনাদের গম্যস্থান বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন—সেই বন্দরের নাম রাজপ্রসাদ। সেখানে আছে সবই—লোকে যাহা-কিছু কামনা করিতে পারে, অন্নবস্ত্র-পদমান সমস্তই রাজভাণ্ডারে বোঝাই করা রহিয়াছে। আমরা ফর্দ্দ ধরিয়া-ধরিয়া উচ্চস্বরে চাহিতে আরম্ভ করিলাম—ডাঙা হইতে উত্তর আসিল, "এস না, তোমরা নামিয়া আসিয়া লইয়া যাও।" কিন্তু আমাদের নামিবার ঘাট নাই; আর-আর সমস্ত বড়-বড় জাহাজে পথ আটক করিয়া নোঙর ফেলিয়া বসিয়া আছে, তাহারা এক-ইঞ্চি নড়িতে চায় না। এদিকে ফর্দ্দ আওড়াইতে আওড়াইতে আমাদের গলা ভাঙিয়া গেল—দিন অবসান হইয়া আসিল। কখনো বা রাগ করিয়া যাহা মুখে আসে তাহাই বলি, কখনো বা চোখের জলে কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসে। কেহ নিষেধও করে না, কেহ পথও ছাড়ে না; বাধাও নাই, সুবিধাও নাই। আর-আর সকলে দিব্য কেনাবেচা

করিয়া যাইতেছে, নিশান উড়িতেছে, আলো জ্বলিতেছে, ব্যাণ্ড্ বাজিতেছে। আমরা সন্ধ্যাকাশের অবিচলিত নক্ষত্ররাজি ও রাজ-বাতায়নের অনিমেষ দীপমালার প্রতি লক্ষ্য করিয়া সকলের পশ্চাৎ হইতে আমাদের "দরিদ্রাণাং মনোরথাঃ" অক্ষুণ্ণ অধ্যবসায়ের সহিত অবিশ্রাম নিবেদন করিয়া চলিলাম।

এইভাবে কত দিন, কত বৎসর কাটিত, তাহা বলিতে পারি না। এমন-সময় এই নিঃসহ নিশ্চলতার মধ্যে বিধাতার কৃপায় পশ্চিম-আকাশ হইতে হঠাৎ একটা বড়-রকম ঝড় উঠিল। আমাদের দেশহিতের জাহাজটাকে পূর্বের মুখে হুহু করিয়া ছুটাইয়া চলিল—অবশেষে যেখানে আসিয়া তীর পাইয়া বাঁচিয়া গেলাম, চাহিয়া দেখিলাম, সে যে আমাদের ঘরের ঘাট। সেখানে নিশান উড়ে না, ব্যাণ্ড্ বাজে না, কিন্তু পুরলক্ষ্মীরা যে হুলুধ্বনি দিতেছেন, দেবালয়ে যে মঙ্গলশঙ্খ বাজিয়া উঠিল। এতদিন অভুক্ত থাকিয়া পরের পাকশালা হইতে কেবল বড়-বড় ভোজের গন্ধটা পাইতেছিলাম, আজ যে দেখিতে দেখিতে সম্মুখে পাত পাড়িয়া দিল। আমরা জানিতাম না, এ যজ্ঞে আমাদের মাতা আমাদের জন্য এতদিন সজলচক্ষে অপেক্ষা করিয়া ছিলেন। তিনিই আজ দীর্ঘ বিচ্ছেদের পরে সুরেন্দ্রনাথের শিরশ্চুম্বন করিয়া তাঁহাকে আপন কোলের দিকে টানিয়াছেন। আমরা আজ সুরেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করি, তিনি সেই পশ্চিমবন্দরের শাদা-পাথরে বাঁধানো সোনার দ্বীপে এমন সুস্নিগ্ধ সার্থকতা একদিনের জন্যও লাভ করিয়াছেন?—এমন আশাপরিপূর্ণ অমৃতবাণী স্বপ্নেও শুনিয়াছেন?

বিধাতার কৃপাঝড়ে সুরেন্দ্রনাথের সেই জাহাজকে যে ঘাটে আনিয়া ফেলিয়াছে' ইহার নাম আত্মশক্তি। এইখানে যদি আমরা কেনাবেচা করিতে পরিলাম, ত পারিলাম—নতুবা অতলস্পর্শ লবণাম্বুগর্ভে ডুবিয়া মরাই আমাদের পক্ষে শ্রেয় হইবে। কাপ্তেন্, এখানকার প্রত্যেক ঘাটে ঘাটে আমাদের বিস্তর লেনাদেনা করিবার আছে—শিক্ষাদীক্ষা, সুখস্বাস্থ্য, অন্নবস্ত্র, সমস্ত আমাদিগকে বোঝাই করিয়া লইতে হইবে—এবারে আর সেই রাজ-অট্টালিকার শূন্যগর্ভ গুম্বজটার দিকে একদৃষ্টিতে দুরবীণ কষিয়া নোঙর ফেলিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। আমরা আজ যে-যাহার ছোটখাট মূলধন হাতে করিয়া ছুটিয়া আসিয়াছি—এবারে আর বাঁধাবন্দরে পুনঃপুন বন্দনাগীত গাওয়া নয়,—এবার পাহাড় বাচাইয়া, ঝড় কাটাইয়া আমাদিগকে পার করিতে হইবে কাপ্তেন্!—তোমার উপরে অনেকের ভরসা আছে—হাল ধরিয়া তোমার হাত শক্ত, ঢেউ খাইয়া তোমার হাড় পাকিয়াছে। এতদিন যে নামের দোহাই পাড়িতে পাড়িতে দিন কাটিয়া গেল, সে নাম ছাড়িয়া আজ যথার্থ কাজের পথে পাড়ি দিবার বেলায় ঈশ্বরের নাম কর, আমরাও এককণ্ঠে তাঁহার জয়োচ্চারণ করিয়া সকলে তোমার চতুর্দ্দিকে সম্মিলিত হই।

আজ অনুনয়সহকারে আমার দেশবাসিগণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছি, আপনারা ক্রোধের দ্বারা আত্মবিস্মৃত হইবেন না—কেবল বিরোধ করিয়া ক্ষোভ মিটাইবার চেষ্টা করিবেন না। ভিক্ষা করিতে গেলেও যেমন পরের মুখাপেক্ষা করিতে হয়, বিরোধ করিতে গেলেও সেইরূপ পরের দিকে সমস্ত

মন বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। জয়ের পন্থা ইহা নহে। এ সমস্ত সবলে উপেক্ষা করিয়া মঙ্গলসাধনের মহৎ গৌরব লইয়া আমরা জয়ী হইব।

আপনারা ভাবিয়া দেখুন, বাংলার পার্টিশন্‌টা আজ খুব একটা বড় ব্যাপার নহে। আমরা তাহাকে ছোট করিয়া ফেলিয়াছি। কেমন করিয়া ছোট করিয়াছি? এই পার্টিশনের আঘাত উপলক্ষ্যে আমরা সমস্ত বাঙালী মিলিয়া পরম বেদনার সহিত স্বদেশের দিকে যেম্‌নি ফিরিয়া চাহিলাম, অম্‌নি এই পার্টিশনের কৃত্রিম রেখা ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্র হইয়া গেল। আমরা যে আজ সমস্ত মোহ কাটাইয়া স্বহস্তে স্বদেশের সেবা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইয়াছি, ইহার কাছে পার্টিশনের আঁচড়টা কতই তুচ্ছ হইয়া গেছে! কিন্তু আমরা যদি কেবল পিটিশন্ ও প্রোটেষ্ট্, বয়কট্ ও বাচালতা লইয়াই থাকিতাম, তবে এই পার্টিশন্‌ই বৃহৎ হইয়া উঠিত,—আমরা ক্ষুদ্র হইতাম,—পরাভূত হইতাম। কার্লাইলের শিক্ষাসর্কুলর্ আজ কোথায় মিলাইয়া গেছে! আমরা তাহাকে নগণ্য করিয়া দিয়াছি। গালাগালি করিয়া নয়, হাতাহাতি করিয়াও নয়। গালাগালি-হাতাহাতি করিতে থাকিলে ত তাহাকে বড় করাই হইত। আজ আমরা নিজেদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতে উদ্যত হইয়াছি—ইহাতে আমাদের অপমানের দাহ, আমাদের আঘাতের ক্ষতযন্ত্রণা একেবারে জুড়াইয়া গেছে। আমরা সকল ক্ষতি, সকল লাঞ্ছনার উপরে উঠিয়া গেছি। কিন্তু ঐ লইয়া যদি আজ পর্য্যন্ত কেবলি বিরাট্ সভার বিরাট্ ব্যর্থতায় দেশের এক প্রান্ত হইতে আর-এক প্রান্ত পর্য্যন্ত ছুটিয়া বেড়াইতাম, আমাদের সানুনাসিক নালিশকে সমুদ্রের এপার হইতে সমুদ্রের ওপার পর্য্যন্ত তরঙ্গিত করিয়া তুলিতাম, তবে ছোটকে ক্রমাগতই বড় করিয়া তুলিয়া নিজেরা তাহার কাছে নিতান্ত ছোট হইয়া যাইতাম। সম্প্রতি বরিশালের রাস্তায় আমাদের গোটাকতক মাথাও ভাঙিয়াছে এবং আমাদিগকে কিঞ্চিৎ দণ্ডও দিতে হইয়াছে। কিন্তু এই ব্যাপারটার উপরে বুক দিয়া পড়িয়া বেত্রাহত বালকের ন্যায় আর্ত্তনাদ করিতে থাকিলে আমাদের গৌরব নষ্ট হইবে। ইহার অনেক উপরে না উঠিতে পারিলে অশ্রুসেচনে কেবল লজ্জাই বাড়িয়া উঠিতে থাকিবে। উপরে উঠিবার একটা উপায়—আমাদের সুরেন্দ্রনাথকে রাজ-অট্টালিকার তোরণদ্বার হইতে ফিরাইয়া-আনিয়া তাঁহাকে আমাদের কুটীর-প্রাঙ্গণের পুণ্যবেদিকায় স্বদেশের ব্রতপতিরূপে অভিষিক্ত করা। ক্ষুদ্রের সঙ্গে হাতাহাতি করিয়া দিনযাপনকেই জয়লাভের উপায় বলে না—তাহার চেয়ে উপরে ওঠাই জয়। আমরা আজ আমাদের স্বদেশের কোনো মনস্বীর কর্ত্তৃত্ব যদি আনন্দের সহিত, গৌরবের সহিত স্বীকার করিতে পারি, তবে এমার্সন্ কবে আমাদের কার সহিত কি ব্যবহার করিয়াছে, কেম্পের আচরণ বেআইনি হইয়াছে কি না, তাহা তুচ্ছ হইতে তুচ্ছতর হইয়া সাময়িক ইতিহাসের ফলক হইতে একেবারে মুছিয়া যাইবে। বস্তুত এই ঘটনাকে অকিঞ্চিৎকর করিয়া না ফেলিলে আমাদের অপমান দূর হইবে না।

স্বদেশের হিতসাধনের অধিকার কেহ আমাদের নিকট হইতে কাড়িয়া লয় নাই—

তাহা ঈশ্বরদত্ত—স্বায়ত্তশাসন চিরদিনই আমাদের স্বায়ত্ত। ইংরেজ রাজা সৈন্য লইয়া পাহারা দিন, কৃষ্ণ বা রক্ত গাউন্ পরিয়া বিচার করুন, কখনো বা অনুকূল কখনো বা প্রতিকূল হউন, কিন্তু নিজের দেশের কল্যাণ নিজে করিবার যে স্বাভাবিক কর্ত্তৃত্ব-অধিকার, তাহা বিলুপ্ত করিবার শক্তি কাহারো নাই। সে অধিকার নষ্ট আমরা নিজেরাই করি। সে অধিকার গ্রহণ যদি না করি, তবেই তাহা হারাই। নিজের সেই স্বাভাবিক অধিকার হারাইয়া যদি কর্ত্তব্যশৈথিল্যের জন্য অপরের প্রতি দোষারোপ করি, তবে তাহা লজ্জার উপরে লজ্জা! মঙ্গল করিবার স্বাভাবিক সম্বন্ধ যাহাদের নাই, যাহারা দয়া করিতে পারে মাত্র, তাহাদের নিকটই সমস্ত মঙ্গল—সমস্ত স্বার্থসঙ্কোচ প্রত্যাশা করিব, আর নিজেরা ত্যাগ করিব না,—কাজ করিব না, এরূপ দীনতার ধিক্কার অনুভব করা কি এতই কঠিন!

তাই আমি বলিতেছি, স্বদেশের মঙ্গলসাধনের কর্ত্তৃত্বসিংহাসন আমাদের সম্মুখে শূন্য পড়িয়া আমাদিগকে প্রতিমুহূর্ত্তে লজ্জা দিতেছে। হে স্বদেশসেবকগণ, এই পবিত্র সিংহাসনকে ব্যর্থ করিয়ো না, ইহাকে পূর্ণ কর। রাজার শাসন অস্বীকার করিবার কোনো প্রয়োজন নাই—তাহা কখনো শুভ কখনো অশুভ, কখনো সুখের কখনো অসুখের আকারে আমাদের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া যাইবে, কিন্তু আমাদের নিজের প্রতি নিজের যে শাসন, তাহাই গভীর, তাহাই সত্য, তাহাই চিরস্থায়ী। সেই শাসনেই জাতি যথার্থ ভাঙেগড়ে, বাহিরের শাসনে নহে। সেই শাসন অন্ত আমরা শান্তসমাহিত পবিত্রচিত্তে গ্রহণ করিব।

যদি তাহা গ্রহণ করি, তবে প্রত্যেকে স্বস্বপ্রধান হইয়া অসংযত হইয়া উঠিলে চলিবে না। একজনকে মানিয়া আমরা যথার্থভাবে আপনাকে মানিব। একজনের মধ্যে আমাদের সকলকে স্বীকার করিব। একজনের দক্ষিণহস্তকে আমাদের সকলের শক্তিতে বলিষ্ঠ করিয়া প্রত্যেকের হস্ত করিয়া তুলিব। আমাদের সকলের চিন্তা তাঁহার মন্ত্রণাগারে মিলিত হইবে এবং তাঁহার আদেশ আমাদের সকলের আদেশরূপে বাংলাদেশের ঘরে ঘরে ধ্বনিত হইয়া উঠিবে।

আপনাদের যদি অভিমত হয়, তবে আর কালবিলম্বমাত্র না করিয়া বঙ্গদেশের এই মঙ্গলমহাসনে সুরেন্দ্রনাথের অভিষেক করি। জানি, এরূপ কোনো প্রস্তাব কখনই সর্ব্ববাদিসম্মত হইতেই পারে না, কিন্তু তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিলে চিরদিন কেবল অপেক্ষা করিয়াই থাকা হইবে, তাহার বেশি আর কিছুই হইবে না। যাঁহারা প্রস্তুত আছেন, যাঁহারা সম্মত আছেন, তাঁহারা এই কাজ আরম্ভ করিয়া দিন। তাঁহারা সুরেন্দ্রনাথকে সমস্ত ক্ষুদ্রবন্ধন হইতে মুক্ত করুন, তাঁহাকে দেশনায়কের উপযুক্ত গৌরবরক্ষার সামর্থ্য দিন, সকলের যোগ্যতা মিলিত করিয়া তাঁহাকে এই পদের যোগ্য করিয়া তুলুন।

যাঁহারা পিটিশন্ বা প্রোটেষ্ট্, প্রণয় বা কলহ করিবার জন্য রাজবাড়ীর বাঁধারাস্তাটাতেই ঘনঘন দৌড়াদৌড়ি করাকেই দেশের প্রধান কাজ বলিয়া গণ্য করেন, আমি সে দলের লোক নই, সে কথা পুনশ্চ বলা

বাহুল্য। সুরেন্দ্রনাথও তাঁহার জীবনের দীর্ঘকাল রাজপথের শুষ্কবালুকায় অশ্রু ও ঘর্ম্ম সেচন করিয়া তাহাকে উর্ব্বরা করিবার চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন, তাহাও জানি। ইহাও দেখিয়াছি, মৎস্তবিরল জলে যাহারা ছিপ ফেলিয়া প্রত্যহ বসিয়া থাকে, অবশেষে তাহাদের, মাছ পাওয়া নয়, ঐ আশা করিয়া থাকাই, একটা নেশা হইয়া যায়, ইহাকে নিঃস্বার্থ নিষ্ফলতার নেশা বলা যাইতে পারে, মানবস্বভাবে ইহারও একটা স্থান আছে। কিন্তু এজন্য সুরেন্দ্রনাথকে আমি দোষ দিতে পারি না, ইহা আমাদের ভাগ্যেরই দোষ। সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার দেশের প্রতিনিধি; দেশের অভিপ্রায় অনুসারেই তিনি দেশকে চালনা করিয়াছেন। দেশেব যদি মোহ ভাঙিত, দেশের আকাঙ্ক্ষা যদি মরীচিকার দিকে না ছুটিয়া জলাশয়ের দিকেই ছুটিত, তবে তিনিও নিশ্চয় তাহাকে সেই দিকে বহন করিয়া লইয়া যাইতেন, তাহার বিরুদ্ধপথে চলিতে পারিতেন না।

তবে নায়ক হইবার সার্থকতা কি, এ প্রশ্ন উঠিতে পারে। নায়কেব কর্ত্তব্য চালনা করা,—ভ্রমের পথেই হউক্, আর ভ্রমসংশোধনের পথেই হউক্। অভ্রান্ত তত্ত্বদর্শীর জন্য দেশকে অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিতে বলা কোনো কাজের কথা নহে। দেশকে চলিতে হইবে; কারণ, চলা স্বাস্থ্যকর,—বলকর। এত-দিন আমরা যে পোলিটিকাল্ অ্যাজিটেশনের পথে চলিয়াছি, তাহাতে অন্য ফললাভ যতই সামান্য হউক, নিশ্চয়ই বললাভ করিয়াছি—নিশ্চয়ই ইহাতে আমাদের চিত্ত সজাগ হইয়াছে, আমাদের জড়ত্বমোচন হইয়াছে। কখনই উপদেশের দ্বারা ভ্রমের মূল উৎপাটিত হয় না, তাহা বারংবার অঙ্কুরিত হইয়া উঠিতে থাকে। ভোগের দ্বারাই কর্ম্মক্ষয় হয়, তেম্‌নি ভ্রম করিতে দিলেই যথার্থভাবে ভ্রমের সংশোধন হইতে পারে, নহিলে তাহার জড় মরিতে পারে না। ভুল করাকে আমি ভয় করি না, ভুলের আশঙ্কায় নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকাকেই আমি ভয় করি। দেশের বিধাতা দেশকে বারংবার অপথে ফেলিয়াই তাহাকে পথ চিনাইয়া দেন—গুরুমহাশয় পাঠশালায় বসিয়া তাহাকে পথ চিনাইতে পাবেন না রাজপথে ছুটা-ছুটি করিয়া যতটা ফল পাওয়া যায়, সেই সময়টা নিজের মাঠ চষিয়া অনেক বেশি লাভের সম্ভাবনা, এই কথাটা সম্পূর্ণ বুঝিবার জন্য বহুদিনের বিফলতা গুরুর মত কাজ করে। সেই গুরুর শিক্ষা যখন হৃদয়ঙ্গম হইবে, তখন যাহারা পথে ছুটিয়াছিল, তাহারাই মাঠে চলিবে—আর যাহারা ঘরে পড়িয়া থাকে, তাহারা বাটেরও নয় মাঠেরও নয়, তাহারা অবিচলিত প্রাজ্ঞতার ভড়ং করিলেও, সকল আশার,—সকল সদ্গতির বাহিরে।

অতএব দেশকে চলিতে হইবে। চলিলেই তাহার সকল শক্তি আপনি জাগিবে, আপনি খেলিবে। কিন্তু রীতিমত চলিতে গেলে চালক চাই। পথের সমস্ত বিঘ্ন অতিক্রম করিবার জন্য বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিদিগকে দল বাঁধিতে হইবে, স্বতন্ত্র পাথেয়গুলিকে একত্র করিতে হইবে, একজনের বাধ্যতা স্বীকার করিয়া দৃঢ় নিয়মের অধীনে নিজেদের মতবিভিন্নতাকে যথাসম্ভব সংযত করিতে হইবে,—নতুবা আমাদের সার্থকতা-অন্বেষণের এই মহাযাত্রা দীর্ঘকাল কেবল ছুটাছুটি-দৌড়াদৌড়ি, ডাকা-ডাকিহাঁকাহাঁকিতেই নষ্ট হইতে থাকিবে।

যাঁহারা সাধক, যাঁহারা দেশের গুরু, তাঁহারা খ্যাতিপ্রতিপত্তির অপেক্ষা না রাখিয়া, বিরোধ-অবমাননার আশঙ্কা স্বীকার করিয়াও দেশের মতি ফিরাইতে চেষ্টা করিবেন—আর যাঁহারা দেশের নায়ক, তাঁহারা দেশকে গতি-দান করিবেন। যে সকল জাতি স্থির হইয়া বসিয়া নাই, যাহারা চলিতেছে, তাহারা এই-ভাবেই চলিতেছে। এক দল উপর হইতে তাহাদের শুভবুদ্ধিকে নিয়মিত করিতেছে, আর-এক দল বক্ষের মধ্যে থাকিয়া তাহাদের প্রাণ-শক্তি-গতিশক্তিকে প্রবর্ত্তিত করিতেছে। এই উভয় দলের পরস্পরে অনেক সময়েই এক মত হয় না, কিন্তু তাই বলিয়া যাহারা চালাইতেছে, তাহাদের বসিয়া থাকিলে চলে না। কারণ, শিক্ষা শুধু উপদেশে নহে, চলার মধ্যেই শিক্ষা আছে।

অতএব এতদিন যে সুরেন্দ্রনাথ বিনা নিয়োগে নিজের ক্ষমতাবলেই দেশকে সাধারণ-হিতের পথে চালনা করিয়া আসিয়াছেন, আজ তাঁহাকে নিয়োগপত্র দিয়া নায়কপদে অভি-ষিক্ত করিবার প্রস্তাব আমি উত্থাপন করিতেছি। নিয়োগপত্র দিলে তাঁহার ক্ষমতা সুনিশ্চিত এবং তাঁহার দায়িত্ব গভীরতর হইবে এবং তিনি কেবলমাত্র শিক্ষিতসম্প্রদায়ের ইংরেজি-বিদ্যার অভ্যস্ত বুলির প্রতি কর্ণপাত না করিয়া আমাদের এই পুরাতন দেশের চিরন্তন প্রকৃতির প্রতি মনোযোগ করিবেন—যে সকল পদার্থ পরদেশের সজীব কলেবরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, যথাস্থান হইতে ভ্রষ্ট হইলে এদেশে যাহা অসঙ্গত-আবর্জ্জনা-রূপে গণ্য হইবে, অনুকরণের মোহে তাহাকে তিনি আদর করিবেন না,—বিরোধমূলক যে সংগ্রামশীলতা য়ুরোপীয় সভ্যতার স্বভাবগত, যাহা কখনই এদেশের মৃত্তিকায় মূলবিস্তার করিয়া ফলবান্ হইবে না, তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া যে মঙ্গলময় মিলনপরতা, যে অবিচলিত ধর্ম্মনিষ্ঠা ভারতবর্ষের চিরকালীন সাধনা, তাহাকেই বর্ত্তমান কালের অবস্থান্তরের সহিত তিনি সঙ্গত করিয়া লইবার চেষ্টা করিবেন। কিন্তু তিনি কি করিবেন না করিবেন, এস্থলে তাহা অনুমান ও আলোচনা করা বৃথা—কেবল ইহাই সত্য যে, তাঁহার করার মধ্যে আমাদেরই কর্ম্ম প্রকাশ পাইবে, দেশ তাঁহারই মধ্য দিয়া নিজেকে ব্যক্ত করিবে, তাঁহারই এক হস্ত দ্বারা নিজের প্রাপ্য গ্রহণ করিবে ও তাঁহারই অন্য হস্ত দ্বারা নিজের দান বিতরণ করিবে—ধর্ম্মবিরুদ্ধ না হইলে, সত্যকে লঙ্ঘন না করিলে ইঁহার বিরুদ্ধে আমরা বিদ্রোহ করিব না এবং এই নিয়ম ও নিষ্ঠাকে স্বেচ্ছাকৃত সুতরাং অলঙ্ঘ্য বাধ্যতা-সহকারে মান্য করাই আমাদের প্রত্যেকের পক্ষে আত্মসম্মান বলিয়া গণ্য হইবে। এইরূপে সমস্ত বলক্ষয়কর দ্বিধা ও সমস্ত আত্মাভি-মানের কুশকণ্টক সবলে উৎপাটিত করিয়া যদি একের মধ্যে আমরা আমাদিগকে নিবিড়-ভাবে একত্র করিতে পারি, তবে আর আমা-দিগকে নিজের শক্তির অহঙ্কার করিবার জন্য সর্ব্বদা আস্ফালন করিতে হইবে না, পরের বিমুখতাকে ফিরাইবার জন্য প্রাণপণে অত্যুক্তির সৃষ্টি করিতে হইবে না—তবেই আমরা শান্তভাবে, বলিষ্ঠ ও ধীরভাবে মহৎ হইতে পারিব এবং নিজের দেশের মধ্যে নিজের যথার্থ স্থানটি অধিকার করিয়া কর্ম্মগৌরবের মধ্যে সার্থকতা প্রাপ্ত হইয়া পোলিটিকাল্ ধনুষ্টঙ্কারের অত্যুগ্র আক্ষেপ হইতে রক্ষা

পাইব—আমরা সুস্থ হইব, স্বাভাবিক হইব, সংযত-আত্মসংবৃত হইব এবং নিজের চাপল্য-বিহীন মর্য্যাদার মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠ হইয়া পরের উপেক্ষাকে অকাতরে উপেক্ষা করিতে পারিব।